১১ নিয়মানুবর্তিতা

মানবজীবনকে সুন্দরভাবে সৃষ্টি করার অন্যতম শর্ত 'নিয়মানুবর্তিতা'। মানবজীবনে নিয়মানুবর্তিতা না থাকলে চালকহীন যানের মতো দিকশূন্য হয়ে যায়। বস্তুত এ বিশ্বজগৎ নিয়মে আবদ্ধ রয়েছে। আর মানুষ প্রকৃতির মধ্যে একটি অংশমাত্র। সুতরাং, প্রত্যেক মানুষকে নিয়মের অধীন হতে হবে। লেখাপড়া, খেলাধুলা, পড়াশোনা, চলাফেরা, খাওয়া-শোওয়া ইত্যাদি বিষয় যে শিক্ষার্থী প্রতিনিয়ত নিয়ম মেনে করে থাকে, তার সফলতা আসবেই। আবার যে জাতি নিয়মের অধীন তার অগ্রগতি স্তব্ধ করা যায় না। যেমন– চীনারা খুবই পরিশ্রমী জাতি। তাই তারা উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করছে। সেনাবাহিনী এবং পৃথিবীর খ্যাতিমান মানুষ নিয়মের অধীন। তাই তাঁরা ক্রমাগত উন্নতি করছেন। আর লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবন দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি লাভ করে থাকে। তাই ছাত্রজীবন থেকেই এ বিষয় সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার। স্মরণযোগ্য যে, আজ যে চারা রোপণ করা হচ্ছে আগামীকাল সে চারাগাছটি বড়ো গাছে পরিণত হবে। সুতরাং, মানবজীবনকে নিয়মের অধীনে এনে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতার অনুপম গুরুত্ব রয়েছে।

১২ অভিধান

অভিধান অর্থ শব্দকোষ বা শব্দভান্ডার। যে বইতে শব্দ, শব্দার্থ, শব্দের উচ্চারণ, শব্দের রূপান্তর ও বানানসহ অনেক শব্দের সুশৃঙ্খল বিন্যাস থাকে, তাকে 'অভিধান' বলে। অভিধানে বর্ণের ক্রম অনুসারে শব্দগুলোকে সাজানো হয়। কোনো অভিধানে শব্দের অর্থ দেওয়া থাকে, কোনোটি উচ্চারণ, আবার কোনোটি বানান অভিধান হিসেবে পরিচিত। এছাড়া আঞ্চলিক ভাষার অভিধান রয়েছে। রয়েছে চরিতাভিধানও। আরেক ধরনের অভিধান খুবই গুরুত্বপূর্ণ; তা হচ্ছে– অনুবাদ অভিধান। এক ভাষার শব্দকে আরেক ভাষায় রূপান্তর; যেমন– বাংলা থেকে ইংরেজি, আরবি থেকে বাংলা, ইংরেজি থেকে বাংলা ইত্যাদি। বানান বা উচ্চারণ নিয়ে প্রায়ই তর্ক-বিতর্ক বা সমস্যার সম্মুখীন হতে দেখা যায় অনেককে। বিতর্কের অবসান ঘটাতে অভিধানের বিকল্প নেই। কারণ অনেক গবেষণা করে ভাষা সম্পর্কে বিজ্ঞজনরা সঠিক শব্দটিই অভিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। বহু বিজ্ঞজন ও কবি-সাহিত্যিকদের সম্মিলিত মতামত, দীর্ঘকালীন চর্চা ও সিদ্ধান্তের ফসল হচ্ছে অভিধান। অভিধান শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কবি-সাহিত্যিকসহ অনুসন্ধিৎসু সকল মানুষের কাজে আসে। তাই প্রত্যেক ভাষার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধান থাকা জরুরি। একজন মানুষ কখনো একটি ভাষার সকল শব্দ মাথায় ধারণ করতে পারে না। তাছাড়া ভাষা বা শব্দ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হতে থাকে। তাই ভাষা বা শব্দের মৌলিকত্বের জন্য অভিধান আবশ্যক। প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষের কাছে তার ভাষার অভিধান থাকা জরুরি।

১৩ গণিত অলিম্পিয়াড

আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড হচ্ছে মাধ্যমিক পড়ুয়া শিক্ষার্থীর জন্য প্রতিবছর অনুষ্ঠিত একটি গণিত অলিম্পিয়াড। আন্তর্জাতিকভাবে ১৯৫৯ সালে প্রথম গণিত অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৯০টি দেশ থেকে সর্বোচ্চ ছয় সদস্যের একটি দল আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে। এ অলিম্পিয়াডে মাধ্যমিক স্তরে পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করতে পারে, যাদের বয়স অনধিক ২০ বছর। প্রশ্নপত্রে ছয়টি সমস্যা থাকে, যার পূর্ণমান ৪২। দুদিনব্যাপী প্রতিযোগিতায় একেকদিন ৩টি করে সমস্যার সমাধান করতে হয়, যার জন্য সাড়ে চার ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতায় দলকে নম্বর না দিয়ে প্রতিযোগীকে নম্বর দেওয়া হয়। প্রতিযোগীদের ব্যক্তিগত নম্বরের ওপর ভিত্তি করে র‍্যাংকিং নির্ধারণ করা হয়। পদকপ্রাপ্তির জন্য ন্যূনতম নম্বর এমনভাবে নির্ধারণ করা হয় যেন সোনা, রুপা ও ব্রোঞ্জপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর অনুপাত প্রায় ১:২:৩ হয়। বাংলাদেশে ২০০২ সালে প্রথমবারের মতো গণিত অলিম্পিয়াড আয়োজিত হয়। এই অলিম্পিয়াড দুই স্তরে (বিভাগীয় উৎসব ও জাতীয় উৎসব) সম্পন্ন হয়। বিভাগীয় উৎসবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা জাতীয় উৎসবে অংশ নেয়। জাতীয় পর্যায়ে কৃতিত্ব প্রদর্শনকারীদের নিয়ে গণিত ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। আর সেখান থেকেই বাছাই করা হয় আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের জন্য বাংলাদেশের জাতীয় গণিত দল।

১৪ আমার প্রিয় লেখক

আমার প্রিয় লেখক হাসান আজিজুল হক। ষাটোত্তর দশকে বাংলা কথাসাহিত্যের যে নবযাত্রা ঘটেছিল তার অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিলেন হাসান আজিজুল হক। চল্লিশোত্তর দশকের প্রবেশমুখে রাঢ়বঙ্গে জন্ম নেওয়া এই কিংবদন্তিতুল্য কথাশিল্পী দেশে-বিদেশে ঈর্ষণীয় মনোযোগ কেড়েছেন পাঠক ও সমালোচক উভয়ের। অতিক্রম করেছেন একের পর এক সাফল্যের সিঁড়ি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অসহ্য উত্তাপ থেকে

শুরু করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মন্বন্তর, সাতচল্লিশের দেশভাগ, পাকিস্তানি দুঃশাসন, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধোত্তর সামরিক শাসন ও রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সব ইতিহাস তাঁর লেখায় উঠে এসেছে। 'আত্মজা একটি করবী গাছ', 'মা মেয়ের সংসার, 'সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য', 'জীবন ঘষে আগুন', 'নামহীন গোত্রহীন', 'পাতালে হাসপাতালে', 'আমরা অপেক্ষা করছি', 'রোদে যাবো' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ। তাঁর গল্পের মুনশিয়ানায় মুগ্ধ হয়ে পাঠক তাঁকে 'ছোটোগল্পের রাজপুত্র' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। শুধু গল্পই নয়; উপন্যাস, প্রবন্ধ, আত্মজীবনী রচনাতেও হাসান আজিজুল হক তাঁর অসাধারণত্ব প্রমাণ করেছেন। 'আগুনপাখি' উপন্যাসের জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গের 'আনন্দ' পুরস্কার পেয়েছেন। হাসান আজিজুল হক সাম্প্রতিক সময়ে বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী আমাকে প্রতিনিয়ত মুগ্ধ করে। আমি মোহমুগ্ধ হয়ে আস্বাদন করি প্রিয় এই কথাশিল্পীর সাহিত্যরস।

১৫ পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি

পরিশ্রম সাধনায় সিদ্ধি এনে দেয়। বিদ্যার্থী যথারীতি পরিশ্রম করে যেমনি বিদ্যা অর্জন করে, তেমনি ধন, মান ইত্যাদিও অর্জন করতে পারে। মানবজীবন সংগ্রামের জীবন। সেই সংগ্রামে টিকে থাকতে হলে, জয়লাভ করতে হলে; পরিশ্রমকে প্রধান হাতিয়াররূপে বরণ করে নিয়ে সেপথে অগ্রসর হতে হবে। এই কর্মময় সংসারে ভাগ্য বলে কোনো অলীক সোনার হরিণের সন্ধান অদ্যাবধি মিলেনি। বাহ্যদৃষ্টিতে মানুষ যাকে ভাগ্যদেবী নামে অভিহিত করে, তা মূলত মানুষের প্রাণান্ত প্রচেষ্টারই ফসল। মানুষ নিরলস প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত ত্যাগ স্বীকারের বদৌলতে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি হাসিল করে। কর্মবিমুখ ব্যক্তি অলস চিন্তার প্রশ্রয়ে যা কিছু চিন্তাভাবনা করে তা আকাশকুসুম রচনার মতোই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ভাগ্যদেবী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কারোর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের সংস্থান করে দিয়েছেন এমন নজির মর্ত্যলোকে মেলে না। মানব ইতিহাস থেকে প্রমাণ মেলে যে, সৃষ্টির প্রারম্ভিক স্তরে অসহায় মানুষ যখন হিংস্র প্রাণীর উপদ্রব ও বৈরি প্রকৃতির নির্মমতার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য বুকফাটা আহাজারি শুরু করেছিল, তখন কোনো ঐশীশক্তি বা দেবতা তার আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তখন মানুষই একে অন্যের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছে এবং পরস্পরের সহযোগিতায় বৈরি প্রকৃতির সাথে নিরলস সংগ্রাম করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। তাই নিঃসংশয়ে একথা বলা যায় যে, পরিশ্রমের দ্বারাই সৌভাগ্য অর্জন করা যায়, পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি।

১৬ এইডস

এইডস হচ্ছে অন্যতম ভয়ানক একটি রোগ, যার কোনো প্রতিকার আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। HIV-এর পূর্ণরূপ Human Immunodeficiency Virus। কিছু রোগ বিস্তারকারী ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের আক্রমণ থেকে টিকে থাকার জন্য যে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা মানুষের রয়েছে, তা এ রোগের ফলে ধ্বংস হয়ে যায়। তাই সে অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয় এবং অবশেষে অকালে বেদনাদায়ক মৃত্যুবরণ করে। আমেরিকা ও আফ্রিকাতে সর্বোচ্চ সংখ্যক এইডস রোগী পাওয়া যায়। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এ ভয়াবহ রোগটি এশিয়ার দেশগুলোতে একইভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও এইডস ভাইরাস চিকিৎসার জন্য গবেষণা এবং এর প্রতিষেধক আবিষ্কারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, তবে এখনো কোনো ইতিবাচক প্রতিকার পাওয়া যায়নি। কেবল প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, যেমন– অসাবধানী যৌনাচার এবং পরীক্ষণবিহীন রক্ত সঞ্চালন বন্ধ করতে হবে। এইডস সংক্রমণের অন্যতম মারাত্মক ফল হচ্ছে রোগীর ওপর আরোপিত সামাজিক কলঙ্ক।

১৭ চরিত্র

চরিত্র মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। চারিত্রিক গুণই মানুষকে সত্যিকারের মানুষ করে তোলে, বাঁচিয়ে রাখে, অমর করে রাখে। মানবজীবনের বিকাশ ও উন্নতির জন্য ভালো চরিত্রের অধিকারী হওয়া দরকার। চরিত্রহীন লোক নানা রকম অন্যায় ও অসত্যের পূজারি। চরিত্রবান ব্যক্তি সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী। মানুষের মহিমা অমল চরিত্রের আলোকেই দ্যুতি পায়। টাকাপয়সা, ধনদৌলতের বিনাশ আছে কিন্তু সচ্চরিত্রের বিনাশ নেই। গাড়ি-বাড়ি, ধনসম্পত্তি, শিক্ষাগত যোগ্যতা– সবকিছুই মূল্যহীন হয়ে পড়ে যদি কোনো ব্যক্তি চরিত্রহীন হয়। পক্ষান্তরে চরিত্রবলে বলীয়ান মানুষ সবার শ্রদ্ধা আদায় করতে পারে। কারণ চরিত্রবান মানুষ সকলকে সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের পথে বিচরণ করতে সাহায্য করে। একজন সচ্চরিত্রবান লোকের সংস্পর্শে আসলে মানুষ আদর্শ, সত্য ও সুন্দর পথের সন্ধান পায়। পক্ষান্তরে দুশ্চরিত্র ব্যক্তি সমাজ ও জাতির জন্য অকল্যাণকর। তারা মানুষে মানুষে বিভেদ, কাটাকাটি, হিংসাবিদ্বেষ, লোভলালসার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়ে পরিবেশকে কলুষিত করে। চরিত্র মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বের পরিচয় বহন করে। যে সকল গুণ মানুষকে মহত্ত্বের পরিচয় দান করে, যে সকল গুণ মানুষকে মহত্ত্বের গৌরবতিলক পরিয়ে দেয়, তার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে চরিত্র। চরিত্রবলেই মানুষ জগতের বুকে

অবিনশ্বর কীর্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়। চরিত্রগুণেই মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় হয়। তাই প্রত্যেক মানুষেরই চারিত্রিক দৃঢ়তা থাকা প্রয়োজন।

১৮ উয়ারী-বটেশ্বর

উয়ারী-বটেশ্বর হলো সুপ্রাচীন নগর-জনপদ, যা রাজধানী ঢাকা থেকে ৭০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে নরসিংদীর বেলাবো ও শিবপুর উপজেলায় অবস্থিত। আসলে 'উয়ারী' এবং 'বটেশ্বর' পাশাপাশি দুটি গ্রাম। ১৯৩৩ সালে 'উয়ারী' গ্রামে মাটি খননের সময় শ্রমিকরা পাত্রে জমানো কিছু মুদ্রা পায়। এগুলো ছিল বঙ্গদেশের এবং ভারতের প্রাচীনতম রৌপ্যমুদ্রা। স্থানীয় স্কুলশিক্ষক মোহাম্মদ হানিফ পাঠান সেখান থেকে ২০-৩০টি মুদ্রা সংগ্রহ করেন। যা ছিল উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহের প্রথম চেষ্টা। ১৯৫৫ সালে 'বটেশ্বর' গ্রাম থেকে ত্রিকোণাকার ও একমুখ চোখা ভারী দুটি লৌহপিণ্ড পাওয়া যায়। তারপর ১৯৫৬ সাল থেকে এখন পর্যন্ত উয়ারী-বটেশ্বরের মাটি খনন করে পাওয়া গেছে আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন দুর্গ-প্রাচীর, ইটের স্থাপত্য, বন্দর, রাস্তা, গয়না, ধাতব বস্তু, অস্ত্র, মুদ্রাভান্ডার ইত্যাদি। এসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো দেখে বিশেষজ্ঞদের অভিমত হলো– এই অঞ্চলের মানুষের জীবন যথেষ্ট উন্নত ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সুদূর রোমান সাম্রাজ্য পর্যন্ত উয়ারী-বটেশ্বর রাজ্যের যোগাযোগ ছিল বলে ধারণা করা হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান-এর ধারণা, এই প্রত্নতত্ত্ব স্থাপত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ আর যথাযথ পরিকল্পনায় গড়া। এই সভ্যতা প্রাচীনকালে 'সোনাগড়' নামে বিশ্বজুড়ে পরিচিত ছিল। তবে এখনো উয়ারী-বটেশ্বর থেকে চেষ্টা চালিয়ে আশ্চর্য সব নিদর্শন আবিষ্কার করা হচ্ছে।

১৯ খাদ্যে ভেজাল

খাদ্যে ভেজাল একটি দেশের জন্য গুরুতর অভিশাপ। কেননা এটি সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিতেও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশও এ অভিশাপ থেকে রেহাই পায়নি। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সম্পদ কৃষি জমি। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে আবাদি জমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। ফলে উৎপাদন অনেক কম হচ্ছে। এই কম উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য থেকে অধিক মুনাফা লাভের আশায় কিছু অসৎ ব্যবসায়ী খাদ্যে ভেজাল মিশ্রিত করে। খাদ্যে ভেজাল বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে আশঙ্কাজনক অবস্থায় পৌঁছেছে, যা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। বিভিন্ন ফল; যেমন– আম, কাঁঠাল, লিচু, জাম, কমলা, পেঁপে, কলা ইত্যাদিতে ভেজাল মিশিয়ে সময়ের আগে পাকানো হয়। মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ওষুধ ও ফরমালিন মিশ্রিত করা হয়। ফলের মাসে এসব ফলের লোভ সামলানো বড়োদের জন্য সম্ভব হলেও ছোটোদের জন্য প্রায় অসম্ভব। মা-বাবা বাধ্য হয়েই বিষমিশ্রিত এসব ফল কিনেন। শুধু ফলই নয়– মাছ, চাল, তেল, ঘি, জুস, মসলার গুঁড়া কিসে ভেজাল নেই! ক্ষতিকর এসব বিষ ক্রমাগত খেতে খেতে দেশের অধিকাংশ মানুষ গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকিতে আছে। এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে হয়তো বাংলাদেশে কর্মক্ষম মানুষ খুঁজেই পাওয়া যাবে না। সরকার ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে মাঝে-মধ্যে অভিযান চালিয়ে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীক ধরে ভেজাল খাদ্য নষ্ট করে। এতে করে কি খাদ্যে ভেজাল কমছে? এসব অসাধু ব্যবসায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া দরকার, যাতে ভবিষ্যতে কেউ আর এমন অপরাধ না করে। তাছাড়া মানুষের বেঁচে থাকার জোগান দেয় খাদ্য। তাই খাদ্যে ভেজাল দেশের মানুষের জন্য খুবই ভয়াবহ একটি সমস্যা।

২০ একুশে পদক

একুশে পদক বাংলাদেশের একটি জাতীয় ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পুরস্কার। '৫২-র ভাষাসৈনিকদের স্মরণে ১৯৭৬ সালে এই পুরস্কার প্রদান শুরু হয়। এরপর থেকে প্রতিবছর এই পদক দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট ভাষাসৈনিক, ভাষাবিদ, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, গবেষক, শিল্পী, সাংবাদিক, অর্থনীতিবিদ, দারিদ্র্যবিমোচনে জাতীয় পর্যায়ে অবদান রাখার জন্য সামাজিক ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠানকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রাথমিকভাবে এ পুরস্কারের অর্থমূল্য ২৫,০০০ টাকা দেওয়া হলেও বর্তমানে তা দুই লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এই নগদ অর্থ ছাড়াও ১৮ ক্যারেটের সোনা দিয়ে তৈরি ৩৫ গ্রাম ওজনের একটি পদক ও একটি সম্মাননা সনদ এবং একটি রেপ্লিকা প্রদান করা হয়। প্রথমবারের মতো বঙ্গভবনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে এ পদক প্রদান করা হয়। পরে কবি জসীমউদ্‌দীন ও বেগম সুফিয়া কামাল এ পদকে ভূষিত হন।

২১ পণপ্রথা বা যৌতুক প্রথা

বিবাহসংক্রান্ত ব্যাপারে বরপক্ষ কনেপক্ষের নিকট থেকে যে নগদ টাকা, অলংকার, গৃহসজ্জা এবং বিনোদনমূলক সামগ্রী গ্রহণ করে, তাকে পণপ্রথা বা যৌতুক প্রথা বলে। এটি একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। পণপ্রথা আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবারের জন্য একটি সাধারণ ব্যাপার হলেও দরিদ্র পরিবারের জন্য তা বিড়ম্বনার ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। পণপ্রথা প্রাচীনকাল থেকেই সমাজে প্রচলিত। তবে পূর্বে এই প্রথার ভিন্নরূপ ছিল। আগেকার দিনে বরপক্ষ কন্যাকে নানা রকম গয়নায় সজ্জিত করার পাশাপাশি কন্যার পিতাকে নগদ অর্থ প্রদান করত। কিন্তু কালের আবর্তনে সেই প্রথারই উলটো প্রয়োগ ঘটেছে। ফলে বর্তমান সমাজে কনেপক্ষকেই পণ বা যৌতুক প্রদান করতে হয়। যৌতুক বা পণের কারণে কনেকে বরের সংসারে অনেক নিগ্রহ সহ্য করতে হয়। এর ফলে অমানুষিক নির্যাতন, বিবাহবিচ্ছেদ ও কখনো কখনো প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে। বাংলাদেশে ১৯৮০ সালে যৌতুক নিরোধ আইন প্রণয়ন করা হলেও এর যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় পরিবার ও সমাজজীবনে ব্যাপক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তাই এ ঘৃণ্য প্রথাকে রোধ করার জন্য নারীশিক্ষার প্রসার, নারীর স্বাবলম্বিতা, আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও সামাজিক সচেতনতার প্রয়োজন। পণপ্রথা বা যৌতুক প্রথা রোধ করতে পারলেই পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসবে।

২২ একুশে বইমেলা

নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সুহৃদ হলো বই। বই মানুষের পরম বন্ধু; মানুষে মানুষে প্রীতির বন্ধন। বইপড়া মানুষের এক দুর্নিবার নেশা। এই নেশাতেই মানুষ ছুটে যায় বইমেলায়। বইমেলার ইতিহাস প্রাচীন। ১৮০২ সালে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে 'Mathew Carry'-এর উদ্যোগে বইমেলার প্রথম আসর বসেছিল। বইমেলা হলো আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি বিকাশের অন্যতম ক্ষেত্র। বাংলাদেশে বইমেলার আয়োজন করা হয় ১৯৭৩ সাল থেকে। অমর একুশে দিবসটিকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্যই সূত্রপাত ঘটে একুশে বইমেলার। ভাবতে অবাক লাগে, কোনো সরকারি উদ্যোগ নয়, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে শুরু হয় এই বইমেলা। স্বাধীনতা লাভের সূচনালগ্নে চিত্তরঞ্জন সাহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে মাটিতে পাটি বিছিয়ে এই মেলার আয়োজন করেন। এরপর থেকে বাংলা একাডেমির উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ১লা ফেব্রুয়ারি মেলা শুরু হয় এবং সমাপ্তি হয় ফেব্রুয়ারির শেষ দিনে। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারিতে পুলিশের গুলিতে শহিদ হয়েছিলেন রফিক, জব্বার, বরকতসহ আরও অনেকে। দিনটি ‘শহিদ দিবস’ হিসেবে পরিচিত এবং জাতীয় মর্যাদার সাথে আমাদের দেশে পালিত হয়। অমর একুশকে কেন্দ্র করে উদ্‌যাপিত এই বইমেলা বৃহত্তম বইমেলা। এ মেলা লেখক-পাঠক-প্রকাশকের ত্রিবেদী সঙ্গম। বইমেলায় আসেন বইপাগল পাঠক। বড়ো বড়ো সাহিত্যিকরা জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেন। অভিনীত হয় নাটক, দেশের গান, ভাষার গান। ফলে মেলার প্রাঙ্গণ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

একুশে বইমেলায় নানা ধরনের বই পাওয়া যায়। এটি বই সংগ্রহের একটি উপযুক্ত সুযোগ। শিশু, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সবারই রুচিসম্মত বইয়ের সমাবেশ থাকে এ মেলায়। লেখক-পাঠক-প্রকাশক সকলেই উপকৃত হতে পারে একুশে বইমেলার মাধ্যমে। তাই একুশে বইমেলার গুরুত্ব অপরিসীম।

২৩ তথ্যপ্রযুক্তি

তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাবে শুধু শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই নয়, মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে উন্নত দেশগুলোর জীবনযাত্রা তথ্যপ্রযুক্তি ছাড়া প্রায় অচল। উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে এর ব্যবহার ব্যাপক না হলেও সেখানে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান যে প্রযুক্তিবিদ্যার ওপর নির্ভরশীল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তথ্য কথাটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– পরীক্ষা, অনুসন্ধান, আলোচনা, গবেষণা ইত্যাদি হতে জ্ঞাতব্য বিষয়। প্রযুক্তিবিদ্যা বলতে আমরা বিভিন্ন শিল্পে বিজ্ঞানের নীতিগুলোর ব্যাবহারিক প্রয়োগসংক্রান্ত বিদ্যা বুঝি। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন কম্পিউটার। দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন কৌশলের ভিত্তিতে শিখনকে চিত্তাকর্ষক এবং আনন্দদায়ক করে তোলা। বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। এ ধারাকে আরও বেগবান করতে বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করার ঘোষণা দিয়েছেন। দিন দিন কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ফোন, কেবল-এর ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী এসবের গুরুত্ব বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব কম নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে, ব্যবসায়, সরকারি কর্মকাণ্ডে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে এমনকি মহাকাশ গবেষণায় আজ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। সুতরাং, জীবনের সর্বক্ষেত্রে আজ তথ্যপ্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিহার্য।

২৪ কুটিরশিল্প

দেশের আত্ম-কর্মসংস্থানে কুটিরশিল্প খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটা বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে আত্ম-কর্মসংস্থানের দুয়ার খুলে দেয়। দেশের আর্থিক উন্নয়নের জন্য কুটিরশিল্পের প্রতি নজর দেওয়া উচিত। কুটিরশিল্প স্থাপনের জন্য বড়ো ধরনের পুঁজি কিংবা দামি যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না। মোগল আমলের ঢাকার মসলিন এদেশের মানুষের কাছে কুটিরশিল্পের সবচেয়ে বড়ো অবদান। অতীতে বাংলাদেশের অনেক মানুষই কুটিরশিল্পের সাথে জড়িত ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই রমরমা কুটিরশিল্পের দিন দিন অবনতি হচ্ছে। এখনো কামার, কুমার, তাঁতি, তাম্রকার, স্বর্ণকার, শঙ্খ ব্যবসায়ীসহ আরও অনেকে কুটিরশিল্পের সাথে যুক্ত। তথাপি বাংলাদেশে বিরাজমান কুটিরশিল্পগুলো তরুণদের কর্মসংস্থানের সমস্যা কিছুটা হলেও প্রশমিত করছে। অধিক জনসংখ্যায় ভারাক্রান্ত বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে নিতে হলে কুটিরশিল্পের প্রয়োজনীয়তার দিকে জোর দিতে হবে। কুটিরশিল্প আমাদের ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই শিল্পের সঙ্গে আমাদের জাতীয় উন্নতি ও অবনতি জড়িত। কুটিরশিল্প গ্রামীণ অর্থনীতির প্রাণ। কুটিরশিল্পের মাধ্যমে বেকার সমস্যা প্রশমন ও দারিদ্র্য হ্রাস করা সম্ভব। এই ব্যাপারটি চিন্তা করে কুটিরশিল্পের পুনরুত্থান ও বিস্তৃতি এখন বড়োই প্রয়োজন।

২৫ কম্পিউটার

কম্পিউটার বা গণকযন্ত্র হলো এমন একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যা সুনির্দিষ্ট নির্দেশ অনুসরণ করে গাণিতিক গণনাসংক্রান্ত কাজ করতে পারে। এমন একটি যন্ত্রের নির্মাণ ও ব্যবহারের ধারণা প্রথম প্রচার করেন চার্লস ব্যাবেজ। যদিও তাঁর জীবদ্দশায় তিনি এর প্রয়োগ দেখে যেতে পারেননি। তবে কম্পিউটারকে এখন শুধু গণনাকারী যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। কম্পিউটার এমন এক যন্ত্র, যা তথ্য গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করে। কম্পিউটার সিস্টেমের উপাদানগুলো হলো– হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, হিউম্যানওয়্যার বা ব্যবহারকারী এবং ডেটা/ইনফরমেশন। কম্পিউটারের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। আধুনিক জীবনব্যবস্থার প্রায় সবকিছুই কম্পিউটারনির্ভর। ঘরের কাজ থেকে শুরু করে ব্যাবসায়িক, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে এর অপরিসীম ব্যবহার। সর্বোপরি যোগাযোগ ক্ষেত্রে এটি বিপ্লব ঘটিয়েছে। চিকিৎসা ও মানবকল্যাণে এটি অনন্য সঙ্গী। প্রয়োগের ভিত্তিতে কম্পিউটার দুই প্রকার। যথা: ১. সাধারণ ব্যাবহারিক কম্পিউটার ও ২. বিশেষ ব্যবহারিক কম্পিউটার। আবার গঠন ও প্রচলন নীতির ভিত্তিতে কম্পিউটার তিন প্রকার। যথা: ১. অ্যানালগ কম্পিউটার, ২. ডিজিটাল কম্পিউটার ও ৩. হাইব্রিড কম্পিউটার। ডিজিটাল কম্পিউটারকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়। যথা: ১. মাইক্রোকম্পিউটার, ২. মিনিকম্পিউটার ৩. মেইনফ্রেম কম্পিউটার ও ৪. সুপারকম্পিউটার। কম্পিউটার মানবকল্যাণে অনেক কাজ করে চলেছে এবং মানুষের শক্তি, সময় ও অর্থের অপচয়রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছে।

২৬ গ্রাম্যমেলা

মেলা বাংলার মানুষের কাছে একটি জনপ্রিয় উৎসব। শহরে ও গ্রামে উভয় জায়গায় মেলা অনুষ্ঠিত হয়। যেসব মেলা গ্রাম অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় তা-ই গ্রাম্যমেলা। এ মেলা গ্রামের বাজারে, স্কুলমাঠে বা অন্য কোনো খোলা মাঠেও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এসব মেলায় সাধারণত স্থায়ী কোনো দোকান থাকে না। দূরদূরান্ত থেকে দোকানদাররা সওদা নিয়ে আসে। তারা মেলা হওয়ার নির্দিষ্ট দিনের দুই-তিন দিন আগেই এসে উপস্থিত হয়। মেলায় যেসব জিনিস লোকজনের মন কেড়ে নেয় সেগুলো হলো– মাটির পুতুল, শোলার পুতুল, তুলোর পুতুল, সন্দেশ ও পিঠার ছাঁচ, রঙিন হাঁড়ি, বাটি, ছেলেমেয়েদের খেলনা, বেলুন, কাঠের তৈরি আসবাবপত্র প্রভৃতি। মেলায় বড়োদের চেয়ে ছোটোদের উৎসাহই থাকে বেশি। তারা ক্রয় করে ভেঁপু, বাঁশি ও রংবেরঙের পাখি। মেলার একপাশে থিয়েটার, যাত্রা, বায়োস্কোপ চলতে থাকে। একদিকে পুতুলনাচ চলে, অন্যদিকে নাগরদোলায় সবাই ঘুরপাক খেতে থাকে। এ মেলা শুধু আনন্দই দেয় না– অর্থেরও শক্তি যোগায়। মেলায় কৃষি ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি বেচাকেনা হয়। তাই দেখা যায়, মেলার মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের কিছু উপার্জনের পথও প্রশস্ত হয়। সারা বছরে একটিমাত্র দিন, তাই বহুলোক চাতকের মতো চেয়ে থাকে এ দিনটির জন্য। এত আনন্দের মধ্যেই নিহিত থাকে নিরানন্দের বীজ। কিছু অসৎ লোক এই মেলার সুযোগে বিভিন্ন খারাপ কাজ; যেমন– পকেট মারা, চুরি করা, জুয়া খেলা ইত্যাদি করে থাকে। তবুও মেলা আনন্দেরই উৎসব। এই মেলার আনন্দ সব ধর্মের লোক উপভোগ করে।

২৭ গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরি

গ্রন্থের মাধ্যমে মানুষের ধ্যানধারণা ও জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সভ্যতার অন্যতম উপাদান হলো গ্রন্থ। আর গ্রন্থ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরি। সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে। স্বাধীনভাবে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার বন্ধুর মতো সামনে এসে দাঁড়ায়। গ্রন্থাগারে থাকে নানা ধরনের বইয়ের সমাহার। মানুষের বই পড়ার আগ্রহ থেকেই গ্রন্থাগারের উৎপত্তি। গ্রন্থাগারের ইতিহাস বেশ পুরোনো। প্রথম গ্রন্থগার বা লাইব্রেরি স্থাপিত হয় রোমে। রোম ছাড়াও প্রাচীনকালে ব্যাবিলন, মিশর, চীন, ভারত ও তিব্বতে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। গ্রন্থাগারের উপযোগিতা নিয়ে সংশয়ের কোনো সুযোগ নেই। চিন্তাশীল মানুষের কাছে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা অনেক বেশি। গ্রন্থাগার জ্ঞান আহরণের সহজ মাধ্যম। বই কিনে পড়ার সামর্থ্য অনেকেরই নেই, তাই গ্রন্থাগার সেই অভাব পূরণ করে। আধুনিক বিশ্বে দিন দিন গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাই বড়ো বড়ো গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়ে আসছে। গ্রন্থাগারকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়– ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সাধারণ। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের প্রয়োজনে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন ক্লাব এবং প্রতিষ্ঠানও নিজস্ব উদ্যোগে গ্রন্থাগার স্থাপন করে থাকে। প্রমথ চৌধুরী গ্রন্থাগারকে 'মনের হাসপাতাল' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, গ্রন্থপাঠে মনের অসুখের নিরাময় হয়। বর্তমান বিশ্বে ডিউই পদ্ধতি বা দশমিক পদ্ধতিতে বইয়ের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। গ্রন্থগার থেকে বই খুঁজে পেতে এ পদ্ধতি বেশ সহায়ক। গ্রন্থাগার হলো অবাধ ও মুক্ত শিক্ষার ক্ষেত্র। তাই শিক্ষার প্রসারে গ্রন্থাগারের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

২৮ বর্ষণমুখর দিন

গ্রীষ্মের রিক্ততাকে ঐশ্বর্যের পূর্ণতা দেয় বর্ষাঋতু, আর তার বর্ষণমুখর দিনের আগমন। বর্ষণমুখর দিন খেয়ালি হয়ে থাকে কখনো অতিবর্ষণে, কখনো অল্পবর্ষণে, কখনো বা প্লাবনে। রৌদ্রদগ্ধ তৃষাতুর ধরণিবক্ষকে সে ভরে দেয় সুস্নিগ্ধ শ্যামল সমারোহে। বর্ষণমুখর দিনে আকাশে কালো মেঘের খেলায় চারদিকে আঁধার নামে আর একইসাথে চলে বিদ্যুতের আলো ঝলকানির খেলা। বৃষ্টি নামলে মাতাল হাওয়ার মাতামাতি নিয়ে আসে স্বস্তির আমেজ। আর সবুজ শ্যামল গাছেরা ভিজতে থাকে অপূর্ব সৌন্দর্যকে ধারণ করে। সমস্ত পশুপাখি আর মানুষও নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে বর্ষণমুখর দিনকে উপভোগ করে। দিনের বেলাতেও নিবিড় অন্ধকার সমস্ত পরিবেশকে আবৃত করে রাখে। সারা দিন একটানা বৃষ্টি ধান ও পাটখেতের ওপর দিয়ে দুরন্ত বাতাসের সবুজ ঢেউ, ডোবা-নালা থেকে ব্যাঙের ডাক, দীর্ঘ কর্মহীন জীবন বর্ষণমুখর দিনকে দেয় এক নতুন শ্রী। এর সৌন্দর্যকে অনুভূতি দিয়ে গ্রহণ করতে হয়। বর্ষণমুখর দিনের সার্বিক পরিবেশ মনকে উদাস করলেও আমাদের চোখে অপূর্ব স্নিগ্ধ প্রলেপ লাগিয়ে দেয়। আর এর সৌন্দর্য বর্ণনা করা বাস্তবিকই কঠিন।

২৯ এভারেস্টের চূড়ায় বাংলাদেশের পতাকা

পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্ট। যা নেপালে 'সাগরমাথা' এবং তিব্বতে 'চোমোলাংমা' নামে পরিচিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮,৮৪৮ মিটার উঁচু এই পর্বতশৃঙ্গের গুরুত্ব চোখে পড়ে ১৮৫২ সালে। রহস্যের মায়াজালে ঘেরা এই পর্বতশৃঙ্গ জয়ের ইচ্ছা ছিল পর্বতারোহীদের যুগ যুগ ধরে। ১৯৫৩ সালের ২৯ মে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখর এভারেস্টে প্রথম পা রাখেন তেনজিং নোরগে। ১৯৭৫ সালের ১৬ মে প্রথম নারী হিসেবে এভারেস্টের চূড়ায় পা রাখেন জাপানের জুনকো তাবেই। প্রথম প্রতিবন্ধী হিসেবে ১৯৯৮ সালে এভারেস্ট আরোহণের কৃতিত্ব অর্জন করেন যুক্তরাষ্ট্রের টম হুইটেকার। এভারেস্টের চূড়ায় বাংলাদেশি হিসেবে প্রথম পা রাখেন মুসা ইব্রাহীম। তাঁর পদার্পণের মাধ্যমে ২৩ মে ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ প্রথম এভারেস্ট বিজয়ের গৌরব অর্জন করে। দ্বিতীয় বাংলাদেশি হিসেবে ২০১১ সালের ২১ মে এভারেস্টের চূড়ায় পা রাখেন মোহাম্মদ আবদুল মুহিত। তিনি দুবার এভারেস্ট-জয়ী বাংলাদেশি। প্রথম বাংলাদেশি নারী হিসেবে এভারেস্টের চূড়ায় পা রাখেন নিশাত মজুমদার। মুসা ইব্রাহীম, মোহাম্মদ আবদুল মুহিত, নিশাত মজুমদার, ওয়াসফিয়া নাজরীন, সজল খালেদ সবাই বিশ্বের দরবারে আমাদের গৌরব ও সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছেন। বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে এবং আগামীর সকল পর্বতারোহীর জন্য তাঁরা অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেন।

৩০ বাংলাদেশের নদী

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এদেশের মধ্য দিয়ে জালের মতো ছোটো-বড়ো অসংখ্য নদনদী বয়ে গেছে। এত বেশি নদনদী পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। নদীগুলো আমাদের দেশের মাটিকে যেমন উর্বর করেছে, তেমনি সাধারণ মানুষের জীবিকা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনেক অবদান রেখে চলেছে। নদীই আমাদের দেশের প্রাণ। এদেশের অর্থনীতি নদীগুলোর ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদনদী হলো– পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র। এছাড়া রয়েছে ছোটো-বড়ো বহু শাখানদী। যেমন– ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা,

আত্রাই, গড়াই, তিস্তা, কুশিয়ারা, কর্ণফুলী ও মধুমতিসহ আরও অনেক নদী। একেক নদী একেক রূপ ধারণ করে। নদীর শোভা সত্যিই মনোরম। নদীর দুই ধারের কাশবন ও গাছপালা দেখতে অপরূপ লাগে। নদীর বুকে পালতোলা নৌকা সকলকে মুগ্ধ করে। বলা যায়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নদী ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। নদী আমাদের অনেক উপকার করে। আমরা নদীতে কাপড় ধৌত ও গোসল করি। যাতায়াত ও মালপত্র আনা-নেওয়ার জন্য নদীপথই সেরা। জেলেরা নদীতে মাছ ধরে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। খরা মৌসুমে নদী থেকে জল তুলে সেচের মাধ্যমে শস্য উৎপাদন করা হয়। সব মিলে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ও জাতীয় অর্থনীতিতে নদনদীর গুরুত্ব অপরিসীম। নদনদীর কারণেই আমাদের এ বাংলাদেশ সুজলা, সুফলা ও শস্যশ্যামলা। এদেশের মাটি, মানুষ ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনার সঙ্গে নদনদীর সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর।

৩১ বিজয় দিবস

আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বড়ো অর্জন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় লাভ। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বর্বর পাকিস্তানিদের পরাজিত করে এ দিনটিতে আমরা বিজয় অর্জন করি। আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ হয়েছিল হানাদারমুক্ত। আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশ। একটি নিজস্ব মানচিত্র ও পতাকা। বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ঠিকানা। এ বিজয়ের গৌরব ও আনন্দ অম্লান হয়ে থাকবে চিরদিন। কিন্তু এ বিজয় সহজে আসেনি। দীর্ঘপথ পরিক্রমায় অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার ফলে এ বিজয়লাভ সম্ভব হয়েছে। পাকিস্তানি বর্বর শাসকগোষ্ঠী বাংলার নিরীহ মানুষের ওপর আক্রমণ করে। হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ করে। বীর বাঙালি পাকিস্তানিদের এ বর্বর আক্রমণ রুখে দেয়। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। তাই এ দিনটিকে বিজয় দিবস বলা হয়। অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে প্রতিবছর রাষ্ট্রীয়ভাবে এ দিনটি পালন করা হয়। তাই বিজয় দিবসের চেতনাকে জাতীয় জীবনের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। একটি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিজয় দিবসের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে জাতীয় উন্নতির জন্য আমাদের সকলকে সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একযোগে দেশের উন্নয়নে কাজ করে যেতে হবে।

৩২ মোবাইল ফোন

মোবাইল ফোন তারবিহীন টেলিফোনবিশেষ। মোবাইল (Mobile) অর্থ 'স্থানান্তরযোগ্য', এই ফোন সহজে যে-কোনো স্থানে বহন করা এবং ব্যবহার করা যায় বলে মোবাইল ফোন নামকরণ করা হয়েছে। এটি ষড়ভুজ আকৃতির ক্ষেত্র বা এক-একটি সেল নিয়ে কাজ করে বলে একে সেলফোনও বলা হয়। ড. মার্টিন কুপারকে মোবাইল ফোনের উদ্ভাবকের মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। তিনি ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে প্রথম সফলভাবে এই ফোনের মাধ্যমে কল করতে সক্ষম হন। বাংলাদেশে মোবাইল ফোন প্রথম চালু হয় ১৯৮৯-৯০ সালের মধ্যে। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ৫টি মোবাইল ফোন কোম্পানি আছে। মোবাইল ফোন আধুনিক নাগরিক জীবনের অপরিহার্য অংশ। পাশের ঘরে ফোন করা থেকে পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তে এখন মোবাইল ফোন দিয়ে যোগাযোগ করা হচ্ছে। তবে আধুনিক মোবাইল ফোনে শুধু কথা বলা নয়, এতে যুক্ত হয়েছে নানা ধরনের অ্যাপ্লিকেশন। ছবি তোলা, ভিডিয়ো দেখা, গান শোনা, ই-মেইল আদান-প্রদান, ইন্টারনেট ব্যবহার, গেম খেলা, তাপমাত্রা ইত্যাদি নানা ধরনের কাজ করা যাচ্ছে মোবাইল ফোনেই। ফলে মোবাইল ফোনের উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। এই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পুরো বিশ্বকেই মানুষ নিয়ে আসতে পেরেছে হাতের মুঠোয়। তবে মোবাইল ফোন দিয়ে যেমন অনেক ভালো কাজ হয়, তেমনি এর খারাপ ব্যবহারও হতে পারে। তাই মোবাইল ফোনের উপযুক্ত এবং পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৩৩ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস

১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরু থেকেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যে হত্যাযজ্ঞের সূচনা করেছিল, একেবারে শেষ দিকে এসে পরাজয়ের আগ মুহূর্তে তা রূপ নেয় দেশের বুদ্ধিজীবীদের পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডে। একটি দেশের মূল্যবান সম্পদ হলো সে দেশের বুদ্ধিজীবীগণ। পরাজয় নিশ্চিত জেনে দেশকে মেধা-মননে পঙ্গু করে দিতে এ পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞটি চালানো হয়। ১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর সহায়তায় ধরে নিয়ে যায় জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান– অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, জি সি দেব, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, রাশীদুল হাসান, সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রখ্যাত চিকিৎসক ফজলে রাব্বী, আবদুল আলীম, সাংবাদিক শহীদুল্লা কায়সার, নিজাম উদ্দীন আহমদ, আ.ন.ম.

গোলাম মোস্তফা, সাহিত্যিক সেলিনা পারভীনসহ আরও অনেক বুদ্ধিজীবীকে। এঁদের কেউ-ই আর ফিরে আসেননি। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ে এ সকল বুদ্ধিজীবীদের ক্ষত-বিক্ষত লাশ পাওয়া যায় মিরপুর ও রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে। আবার অনেকের সন্ধানও পাওয়া যায়নি। জাতির এ শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মৃতিকে অমলিন রাখতে ঢাকার মিরপুরে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিবছর ১৪ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীসহ দেশের সর্বস্তরের জনগণ স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

৩৪ সড়ক দুর্ঘটনা

বর্তমানে বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা একটি সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিনিয়ত জনজীবনকে অনিরাপদ করে তুলেছে। এর ফলে প্রাণ হারাচ্ছে অসংখ্য মানুষ। দৈনিক পত্রিকার পাতা খুললেই চোখে পড়ে সড়ক দুর্ঘটনার খবর। সড়ক দুর্ঘটনার জন্য নানা কারণ দায়ী। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কারণ হলো– অসতর্ক চালক, অপ্রশস্ত রাস্তা, অতিরিক্ত যানবাহন, ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন, ট্রাফিক ব্যবস্থার ত্রুটি, ভাঙা রাস্তা, পথচারীর অসচেতনতা ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, চালকরা ট্রাফিক আইন মানছে না। চালকদের অসতর্কতার পাশাপাশি পথচারীর অসচেতনতার কারণেও দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। অসচেতনভাবে রাস্তা পারাপার, ফুট ওভারব্রিজ ব্যবহার না করাও সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। দুর্ঘটনা যেভাবেই ঘটুক না কেন এর ফলাফল অত্যন্ত ভয়ংকর। এ দুর্ঘটনা এড়াতে প্রয়োজন দক্ষ চালক তৈরি, ট্রাফিকব্যবস্থার উন্নয়ন, ত্রুটিমুক্ত যানবাহন, উন্নত রাস্তা, পথচারীর সচেতনতা ইত্যাদি। সর্বোপরি সড়ক দুর্ঘটনা এড়াতে রাষ্ট্রীয়ভাবে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবেই জনজীবন হবে নিরাপদ এবং সড়ক দুর্ঘটনামুক্ত।

৩৫ স্বেচ্ছায় রক্তদান

মানবজীবনে জনকল্যাণ কথাটির তাৎপর্য যুগে যুগে বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হয়েছে। মানুষ সামাজিক জীব। পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে মানুষের জীবন বিকাশ লাভ করেছে। এই সহযোগিতার অন্যতম উপায় স্বেচ্ছায় রক্তদান। রক্ত ছাড়া মানবদেহ সচল থাকতে পারে না। অনেক মুমূর্ষু রোগী মাঝে মাঝেই রক্তের জন্য প্রাণ হারান, আর তাই বিজ্ঞাপনে আমরা মাঝে মাঝেই রক্তদানের জন্য আকুল আবেদন দেখতে পাই। ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি সমর্থ ব্যক্তিদের স্বেচ্ছায় রক্তদান করা উচিত। আর সেজন্য রয়েছে নানা ধরনের স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি। এইরকমই একটি কর্মসূচি ‘বাঁধন’-এ আমি আমার বড়ো ভাইয়ের সাথে গিয়ে মাঝে মাঝে রক্তদান করি। স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে অন্যের জীবনের জন্য সামান্য অবদান রাখতে পেরে আমার নিজেকে সার্থক মনে হয়। আমার রক্তের গ্রুপ ‘O’ পজেটিভ– যাকে সর্বজনীন দাতা রক্তগ্রুপ বলা হয়। রক্তদানের ক্ষেত্রে নিজের জীবনের যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা উচিত। তবে প্রতিটি সুস্থ ও সবল মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করলে বাংলাদেশে মৃত্যুহার কমানো সম্ভব।

৩৬ বিজ্ঞান মেলা

বিজ্ঞান মেলা একটি সমাজ ও জাতির বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ এবং সভ্যতাকে প্রদর্শনের দায়িত্ব পালন করে। বছরের বিভিন্ন সময়ে আমাদের দেশের অনেক প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করে। বিজ্ঞান মেলার আওতা বা পরিধি প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের অসংখ্য প্রবীণ, তরুণ ও খুদে বিজ্ঞানী এবং দর্শনার্থী এ মেলায় অশংগ্রহণ করে। বর্তমান বিজ্ঞান মেলায় কম্পিউটার স্থায়ীভাবে জায়গা করে নিয়েছে। মেলায় বিভিন্ন সফটওয়্যার প্রোগ্রামের ওপরে প্রক্ষেপণ আলোকচিত্র প্রদর্শিত হয়ে থাকে। এ ধরনের বিজ্ঞান মেলা থেকে স্কুল-কলেজের খুদে বিজ্ঞানীরাও উপকৃত হয়। শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে, শিক্ষকরা এ মেলায় বেশি আসেন। আমাদের দেশে বিজ্ঞান মেলা একটানা বেশ কয়েকদিন চলে। চাক্ষুষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বিজ্ঞান মেলা আসলেই একটি বাস্তব ও কার্যকরী ক্ষেত্র। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। তাই বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাকে অনুপ্রাণিত করার জন্য বিজ্ঞান মেলার আয়োজন নিতান্ত প্রয়োজন। নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞান প্রতিভার সাথে পরিচিত করাতে হলে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ইত্যাদি জেলাসহ দেশের অন্যান্য স্থানে বিজ্ঞান মেলার আয়োজনের মাধ্যমে বিজ্ঞানের ব্যবহার সম্পর্কে প্রচারণা চালাতে হবে। বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে আমাদের সভ্যতাকে খাপ খাওয়ানোর জন্য বিজ্ঞান মেলার প্রয়োজনীয়তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিজ্ঞান মেলা আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বিজ্ঞানমুখী হতে সহযোগিতা করে। বিজ্ঞান মেলা একটি সভ্য জাতির বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাচেতনা ও ধ্যানধারণার নিশ্চায়ক।

৩৭ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

আধুনিক জীবনে প্রযুক্তির বিস্তৃতির সাথে সাথে আমাদের যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ঘটেছে নতুন বিপ্লব। যোগাযোগের মাধ্যম বলতে কিছুকাল আগেও বোঝা যেত মোবাইল কল, এসএমএস ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে যোগাযোগের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যমগুলো হলো– ফেসবুক, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার, স্কাইপ, টুইটার, গুগল প্লাস, লিঙ্কডইন ইত্যাদি। ইন্টারনেটের সাহায্যে এসব যোগাযোগ মাধ্যমে খুব সহজেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারি। আর এগুলোই হলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। এ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর সাহায্যে আমরা সহজেই পরস্পরের সাথে কথা বলতে পারছি, একজন আরেকজনের অবস্থান বুঝতে পারছি, মুহূর্তের মধ্যেই বিভিন্ন দেশের সংবাদ জানতে পারছি। এ ছাড়াও আরও বিভিন্ন সুবিধা এসব থেকে আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু এর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার ও অপব্যবহার খুবই ক্ষতিকর। বিশেষ করে, ছাত্রছাত্রীরা এসব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশি আসক্ত হয়ে পড়ে; যার দরুন তাদের পড়ালেখায় ক্ষতি, মনোযোগ নষ্ট ও অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয়। এ মাধ্যমগুলোর ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষের গোপনীয়তা হ্রাস পাচ্ছে। আমাদের দায়িত্বশীল ও সচেতন ব্যবহারই পারে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে।

৩৮ স্বাস্থ্যই সম্পদ

কথায় আছে, স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্য একজন মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। একজন মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না নির্ভর করে স্বাস্থ্যের ওপর। ভগ্ন স্বাস্থ্যের একজন মানুষের কাছে অর্থ, যশ, খ্যাতি, সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি সবকিছু অর্থহীন। যেহেতু স্বাস্থ্যের চেয়ে বড়ো কোনো সম্পদ নেই, তাই স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। একজন স্বাস্থ্যহীন ধনবান ব্যক্তির চেয়ে ধনহীন স্বাস্থ্যবান লোক অধিকতর সুখী জীবনযাপন করে। সুন্দর স্বাস্থ্য শুধু শরীরের ওপর নির্ভর করে না। যে ব্যক্তির শরীর ও মন দুটিই সুস্থ, সে-ই প্রকৃত স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি। শরীর বা মনের যেকোনো একটির অসুস্থতা স্বাভাবিক জীবনযাপনকে ব্যাহত করে। শরীরকে সুস্থ রাখতে হলে নিয়মিত শরীরচর্চা করা উচিত, তাতে শরীর ও মন দুই-ই প্রফুল্ল থাকে। ভালো স্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত পরিমাণমতো সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হবে এবং যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম থেকে উঠতে হবে। বয়স অনুযায়ী খাবার ও পানীয় গ্রহণ এবং ঘুমই সুন্দর স্বাস্থ্যের পাথেয়। সেই সাথে দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপন করা অবশ্যই জরুরি। সর্বোপরি ‘সুস্থ দেহে সুস্থ মনের বাস।’– এ তত্ত্বকে মাথায় রেখে পরিমিত পরিশ্রম, পরিমিত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ এবং প্রয়োজনমতো বিশ্রাম করলেই সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপন সম্ভব।

৩৯ স্বাধীনতা দিবস

স্বাধীনতা দিবস আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও স্মরণীয় একটি দিন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল এদেশের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম। এ দিনটি স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মমর্যাদার বর্ণিল স্মারক। ১৯৭০ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। কিন্তু গণমানুষের রায়কে উপেক্ষা করে পাকিস্তান সরকার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করে। এদেশের মানুষ তা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। বাংলার মানুষ আন্দোলন শুরু করে। বাংলার মানুষের আন্দোলনে ভীত হয়ে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বর্বর শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের নিরস্ত্র নিরীহ মানুষের ওপর আক্রমণ চালায়। সারা দেশব্যাপী হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগসহ নানা ধরনের বর্বরতা চালায়। এদেশের অকুতোভয় বাঙালি পাকিস্তানি বর্বর শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘষের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল বলে ২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। প্রতিবছর এ দিনটি রাষ্ট্রীয়ভাবে বিশেষ মর্যাদায় পালন করা হয়। স্বাধীনতা দিবস আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গৌরবের ও মর্যাদার।

৪০ বিসিএস পরীক্ষা

বিসিএস-এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে ‘বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস’। বিসিএস পরীক্ষা হলো দেশব্যাপী পরিচালিত একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, যা বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (বিপিএসসি) কর্তৃক বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিসিএস (প্রশাসন), বিসিএস (কর), বিসিএস (পররাষ্ট্র), বিসিএস (পুলিশ)-সহ ২৬ পদে কর্মী নিয়োগের জন্য পরিচালিত হয়। যা পূর্বে ২৭টি থাকলেও ২০১৮ সালে ইকোনমিক ক্যাডার প্রশাসন ক্যাডারের সাথে একত্র হয়ে ২৬টিতে পরিণত হয়। ব্রিটিশ শাসনামলে ব্রিটিশ-ভারতীয় সরকারের ইম্পেরিয়াল সিভিল সার্ভিসের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে চাকরি প্রত্যাশীদের জন্য বিসিএস পরীক্ষাকে

সবচেয়ে বড়ো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ পরীক্ষায় আবেদনকারীকে অবশ্যই উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর চার বছরের অনার্স পাশ হতে হবে। কেউ যদি তিন বছরের অনার্স বা পাশ কোর্সে পড়ে থাকে তাহলে তাকে অবশ্যই মাস্টার্স পাশ হতে হবে। শিক্ষাজীবনে একের অধিক তৃতীয় শ্রেণি থাকলে এ পরীক্ষায় আবেদনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। বিবিএস বিধিমালা–২০১৪-এর বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তিন স্তরে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে– প্রাথমিক পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষা। প্রতিটি স্তরে নির্দিষ্ট নম্বরে পরীক্ষা হয়। প্রাথমিক পরীক্ষা (MCQ – ২০০ নম্বর), লিখিত পরীক্ষা (৯০০ নম্বর) এবং মৌখিক পরীক্ষা (২০০ নম্বর)। প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে লিখিত পরীক্ষায় এবং লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আবেদনকারী মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হন। পিএসসি আবেদনকারীদের লিখিত পরীক্ষার নম্বর এবং মৌখিক পরীক্ষার সংগৃহীত নম্বরের ওপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত যোগ্যতা নির্ধারণ করে। এ পরীক্ষা পদ্ধতিতে শতভাগ প্রার্থী মেধা অনুসারে বাছাই করা হয়। পিএসসি যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিশেষ সুপারিশ করে। এরপর মন্ত্রণালয় পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পুলিশ ভেরিফিকেশন এবং এনএসআই ভেরিফিকেশন শেষে তাদের নাম গেজেট আকারে প্রকাশ করে। গেজেটে প্রকাশিত ব্যক্তিবর্গই বিসিএস ক্যাডার হিসেবে পরিগণিত হয়।

৪১ লোডশেডিং

সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়ে যা কেড়ে নেয় নগরজীবনের স্বস্তি আর স্বাচ্ছন্দ্য, তা হচ্ছে লোডশেডিং। বিজ্ঞানের কল্যাণস্পর্শে বিদ্যুতের ব্যবহার জীবনকে করে তুলেছে সহজ ও আনন্দমুখর। বিদ্যুতের ব্যবহার যত বাড়ছে জীবন তত স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখছে। কিন্তু এত স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝেও লোডশেডিং জীবনকে করে তোলে বিপন্ন। বাসাবাড়িতে লোডশেডিং জীবনকে যতটা বিপর্যস্ত করে, তার থেকে আমরা আরও বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হই অফিস-আদালত, শিল্পকারখানায় লোডশেডিং হলে। এটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়। এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ, দেশীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে আমরা খুব সহজেই বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করতে পারি। অনায়াসে দূর করতে পারি লোডশেডিং। তবে একই সাথে জনগণের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। অপ্রয়োজনে বিদ্যুৎ ব্যবহার না করে ও অপচয় কমিয়ে অর্থাৎ, সচেতন নাগরিক হয়ে আমরা দেশীয় সম্পদ রক্ষা করতে পারি এবং দূর করতে পারি লোডশেডিং সমস্যা। আর এই সমস্যা দূর হলে দেশ ও জাতি এগিয়ে যেতে পারে উন্নতির পথে।

৪২ শিক্ষাসফর

ছাত্রজীবনে শিক্ষাসফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেবল পাঠ্যভুক্ত জ্ঞানই আমাদের জ্ঞানের তৃষ্ণা মিটাতে যথেষ্ট নয়। বইভিত্তিক জ্ঞান সীমিত এবং এ কারণেই শিক্ষাসফরের বিষয়টি প্রায়ই আসে। পরীক্ষামূলক জ্ঞান যাকে অন্য কথায় বলে অভিজ্ঞতা; তা শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যকারিতা ও প্রভাব উপলব্ধি করার জন্য খুবই প্রয়োজন। পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ শিক্ষার রস জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে খুবই ফলপ্রসূ। এরূপ শিক্ষা অর্জনে শিক্ষাসফর বিজ্ঞ পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করে। সব দিক বিবেচনা করেই বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষাসফরের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রতিবছরই এসব প্রতিষ্ঠানের অনেক শিক্ষার্থী এরূপ শিক্ষাসফরে যায়। শিক্ষাসফর অন্যান্য জাতির ভূগোল, ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি প্রশস্ত করে। একই সাথে শিক্ষাসফর হচ্ছে ভ্রমণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান আহরণ। শিক্ষাসফর থেকে আহরিত জ্ঞান বইকেন্দ্রিক জ্ঞান অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী। 'দেখাই বিশ্বাস'– এই কথাটার তাৎপর্য শিক্ষাসফরের মতো কার্যাবলির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। চাক্ষুষ এবং চিত্তাকর্ষক জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে শিক্ষাসফরের বিকল্প নেই।

৪৩ শ্রমের মর্যাদা

জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পরিশ্রমের মর্যাদা রয়েছে। সর্বস্তরের মানুষের পক্ষে পরিশ্রমের মর্যাদাবোধ পরিশ্রমেরই যোগ্য পুরস্কার। কায়িক পরিশ্রম আত্মসম্মানের পক্ষে মোটেও হানিকর নয়, বরং শ্রমই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ উপায়। জগতের সকল কাজই শ্রমসাপেক্ষ। কায়িক পরিশ্রমেই শিল্পী ও বিজ্ঞানী উদ্ভাবনীশক্তিকে বাস্তবে পরিণত করে তা মানবকল্যাণে নিয়োজিত করে। ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত বা জাতিগত সকল উন্নতির মূলে রয়েছে শ্রম ও অধ্যবসায়। পৃথিবীতে যে জাতি যত পরিশ্রমী সে জাতি তত উন্নয়নশীল। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পরিশ্রমই বর্তমান সভ্যতা সৃষ্টি করেছে। শ্রম যে শুধু ব্যক্তিজীবনকেই সার্থকতায় সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যময় করে তোলে তা নয়। সমাজজীবনের ওপরও গভীর রেখাপাত করে। তাই পরিশ্রম শুধু সৌভাগ্যের নিয়ন্ত্রকই নয়, সভ্যতা বিকাশেরও হাতিয়ার। সুতরাং জীবনকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য শ্রম ব্যতীত অন্য কোনো সহজ পথ নেই। আর তাই শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ব্যক্তিগত তথা জাতিগতভাবে প্রয়োজন।

৪৪ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশের সংস্কৃতি বৈচিত্র্যময়। বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা, জাতি ও সংস্কৃতি নিয়ে আমাদের বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মূল জনগোষ্ঠী হচ্ছে বাঙালি। বাঙালি ছাড়াও এখানে অনেক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বসবাস রয়েছে। বাঙালিদের মতো তাদেরও রয়েছে নিজস্ব ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি। বাংলাদেশের অসংখ্য ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, ত্রিপুরা, গারো, মণিপুরি, হাজং, খাসিয়া, টিপরা উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে চাকমাই সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। এসব ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সিংহভাগের বসবাস পার্বত্য চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, সিলেট ও রাজশাহী অঞ্চলে। প্রত্যেকটি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীরই রয়েছে নিজস্ব ভাষা, পরিচয়, সংস্কৃতি ও জীবনাচার। এ দেশের সকল মানুষ জাতীয়তার পরিচয়ে বাংলাদেশি এবং সকলেই দেশপ্রেমী। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর ভিন্ন সংস্কৃতি ও জীবনাচার আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে বিশ্বদরবারে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। সকলের সহাবস্থানে দেশ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের পাশাপাশি এ দেশের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এ ছাড়াও এ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এ দেশের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী।

৪৫ শিষ্টাচার

মানবজীবনের সৌন্দর্য হলো শিষ্টাচার। অংলকার যেমন নারীর দেহের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয় তেমনি মানবজীবনের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয় শিষ্টাচার। শিষ্টাচার হচ্ছে মনুষ্যত্বের পরম সম্পদ। অলংকার মানুষের জীবনের বাইরের বস্তু, যা বাহির থেকে দেখা যায়; কিন্তু শিষ্টাচার হলো মানুষের অন্তরের সামগ্রী। এসব গুণগত বৈশিষ্ট্যের জন্য মানুষ সকলের প্রিয় ও বরেণ্য হয়ে ওঠে। কেবল ব্যক্তিগত জীবনে নয় সমাজ-জীবনেও এই গৌরব পরিলক্ষিত হয়। মানুষের জীবনকে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য শিষ্টাচার অপরিহার্য। মানবজীবনে শিষ্টাচারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সামাজিক জীব হওয়ার কারণে প্রত্যেক মানুষকে কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়, যা শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। শিষ্টাচার মানুষকে একে অপরের সাথে চলাফেরা, অন্যকে ভালোবাসা এমনকি বড়োদের সম্মান করতে শেখায়। সমাজে এমন আচরণ করতে হবে যেন নিজের আচরণ দ্বারা অন্যজন কোনো কষ্ট না পায়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণ হলো শিষ্টাচার ও সৌজন্য। আজকের ছাত্ররাই আগামী দিনে জাতির কর্ণধার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। শিষ্টাচারের মাধ্যমে ছাত্ররা ভবিষ্যৎ জীবনকে সার্থক করে তুলবে। তাই ছাত্রজীবনে শিষ্টাচারের গুরুত্ব অপরিসীম। এমনকি রাষ্ট্রীয়, পারিবারিক ও সমাজ জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই শিষ্টাচারের প্রয়োজনীয়তা অপরিহায। তবে কথায় আছে, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। সেজন্য শিষ্টাচার যেন কখনো বেয়াদবি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। একটা মানুষের চরিত্র যদি খারাপ হয়, তাহলে সে অধঃপতনের দিকে ধাবিত হয়। চরিত্রের কালিমা শিষ্টাচারের মাধ্যমে দূর করা যায়। সুতরাং, মানুষের একটি মৌলিক গুণ শিষ্টাচার। মূলত ব্যবহার দ্বারা শিষ্টাচার পরিলক্ষিত হয়। তাই শিষ্টাচার হলো মানবজীবনের মুকুটস্বরূপ।

৪৬ বিশ্বায়ন

ইংরেজি Globalization শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো বিশ্বায়ন। সমগ্র বিশ্বকে আধুনিক ও অগ্রগতির এক বলয়ে সমন্বিত করার প্রক্রিয়াই হলো বিশ্বায়ন। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তারের ফলে বিশ্বায়নের সূত্রপাত ঘটেছে। বিশ্বায়নের ফলে সমস্ত দেশ মিলে সৃষ্টি হচ্ছে এক বিশ্বসম্প্রদায়। বিশ্বায়ন রাষ্ট্রীয় সীমানা ছাড়িয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে। ফলে মানুষের চিন্তা-চেতনায় একটি বৈশ্বিক কাঠামো তৈরি হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যে বিশ্বায়নের কথা বলা হচ্ছে তা মূলত পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের উপনিবেশ। ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতে, "বিশ্বায়ন কোনো নতুন বিষয় নয়, এটি পুরাতন বাস্তবতার নতুন নাম এবং সেই বাস্তবতাটি হচ্ছে পুঁজিবাদ।" পুঁজিবাদের মাধ্যমে সম্পদশালী উন্নত দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বের ওপর অর্থনৈতিক নয়া উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠা করে পুঁজিবাদের হাতকে শক্তিশালী করতে চায়। তাদের উপেক্ষা করা সম্ভব না হলেও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে আমাদের সদা সচেতন থাকতে হবে। বিশ্বায়ন ধারণায় তথ্যপ্রযুক্তিতে বিকাশমান এ বিশ্বসমাজের সাথে আমাদের সকল ক্ষেত্রে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।

৪৭ শব্দদূষণ

শব্দবিজ্ঞানের ভাষায় শক্তির এক বিশেষ রূপ, যা আমাদের কানে শ্রবণের অনুভূতি জাগায় তা-ই শব্দ। শব্দ প্রয়োজনীয় হলেও শব্দময় আমাদের এই জগতে শব্দ কখনো কখনো আমাদের জন্য ক্ষতিকর ও বিরক্তিকর হয়ে ওঠে, আর সেটিই হলো শব্দদূষণ। পাখপাখালির

ডাক, মৃদু শব্দ, সংগীতের সুর শ্রুতিমধুর। বিপরীতে যানবাহনের আওয়াজ, রেডিয়ো ও টেলিভিশনের উচ্চশব্দ, গাড়ির হুইস্ল, কলকারখানার সাইরেন, মাইকের আওয়াজ, উড়োজাহাজের শব্দ ইত্যাদি আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। কারণ, এই শব্দগুলো তীব্র ও অতিমাত্রার, এগুলোই সৃষ্টি করছে শব্দদূষণ। শব্দদূষণে আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, আবার কখনো হুমকির কারণ হচ্ছে। শব্দদূষণে শিশুদের ও বড়োদের পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে, মানুষের কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। বিরক্তি উৎপাদক বলে মানুষ মানসিক অবসাদগ্রস্ত হচ্ছে, রোগীরাও শব্দদূষণের কারণে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। উচ্চ শব্দযুক্ত শিল্প কারখানায় যেসব শ্রমিক কাজ করে, তাদের শ্রবণশক্তি ১০ বছরে অর্ধেক হ্রাস পায়। অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে শব্দদূষণ মারাত্মক ক্ষতিকর এক দূষণ। সচেতন ও উদ্যোগী হয়ে আমরা উচ্চ শব্দ তৈরি করা হতে বিরত থাকলে এই দূষণ থেকে রক্ষা পেতে পারি। আর আজকের দিনে আমাদের এই উদ্যোগ ও সচেতনতা অতীব প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪৮ স্বাবলম্বন

'স্বাবলম্বন' শব্দটির অর্থ 'আত্মনির্ভরতা'। মানবজীবনের যে-কোনো কর্মক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তির ওপর নির্ভর না করে অগ্রসর হওয়াকে স্বাবলম্বন বলে। নিজের বুদ্ধি, শ্রমক্ষমতা ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে আত্মশক্তির জাগরণ করতে হয়। আর এর ফলে স্বাবলম্বী মানুষ যে-কোনো কাজে অনায়াসে সাফল্য লাভ করে থাকে। এছাড়া পরনির্ভরশীল ব্যক্তিরা শুধু ভাগ্যের ওপর দোষ চাপিয়ে হতাশা ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে। এদের জীবনে 'হতাশা' মূল্যবান সম্পদ হয়ে থাকে। আর নিজের শক্তি ও সামর্থ্যের ওপর যাদের গভীর বিশ্বাস তারাই কেবল স্বাবলম্বী হতে পারে। তাদের কর্মনিষ্ঠার প্রতি অগাধ বিশ্বাস থাকে। এ কর্মনিষ্ঠাই তাদের বিশ্বস্ত করে রাখে। একথা যথার্থ যে, স্বাবলম্বী না হলে মানবজীবনে উন্নতি সম্ভবপর নয়। ছাত্রজীবনই স্বাবলম্বী হওয়ার সঠিক সময়। বাঙালি জাতির কাছে স্বাবলম্বিতার সেরা দৃষ্টান্ত আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি শৈশব থেকেই সব বিষয়ে স্বাবলম্বী ছিলেন। স্বাবলম্বিতা শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, জাতীয় জীবনেও এর অনুপম গুরুত্ব আছে। বস্তুত যে জাতি স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে না, সে জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি স্তব্ধ হয়ে যায়। সুতরাং, স্বাবলম্বিতার মাধ্যমে আমাদের জাতীয় জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা অনেকাংশেই নির্ভরশীল।

৪৯ মোবাইল ব্যাংকিং

যে পদ্ধতিতে একজন গ্রাহক মোবাইল বা ট্যাব ব্যবহার করে আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করতে পারেন, তাকে মোবাইল ব্যাংকিং বলে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে এ ব্যাংকিং ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা ১৯৯৯ সালে মোবাইল ওয়াপ পদ্ধতির মাধ্যমে স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ইউরোপিয়ান ব্যাংক চালু করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ সালে মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করে। ২০১১ সালের ৩১ মার্চ বেসরকারি খাতের ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালুর মাধ্যমে দেশে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের যাত্রা শুরু হয়। এরপরই ব্র্যাক ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালু করে 'বিকাশ'। বাংলাদেশ সরকারের ডাক বিভাগের 'নগদ' মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালু রয়েছে। মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে খুব সহজে টাকা জমা ও উত্তোলন ছাড়াও কেনাকাটার বিল পরিশোধ, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, বেতন-ভাতা উত্তোলন, রেমিট্যান্স বিতরণসহ মোবাইলে তাৎক্ষণিক ব্যালেন্স রিচার্জ ইত্যাদি সেবা গ্রহণ করা যায়। যে-কোনো অপারেটরের মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীরা এ ব্যাংকিং সেবার আওতায় থাকতে পারেন। এ ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে খুব সহজে এবং সুবিধাজনকভাবে আর্থিক সেবা পাওয়া যায় বলে এর জনপ্রিয়তা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

NABARUN PUBLICATION

৫০ শিশুশ্রম

শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ। আজকের শিশুই আগামী দিনের কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দেশ ও জাতিকে গড়ে তুলবে। অথচ সেই শিশুই শিক্ষা অর্জন করার পরিবর্তে অমানুষিক শ্রমে নিয়োজিত। পেটের তাগিদে তাকে সকাল-সন্ধ্যা পরিশ্রম করতে হয়। সাধারণত চার-পাঁচ বছর বয়স থেকে কিশোর বয়স পর্যন্ত সময়ের শ্রমিকদের শিশুশ্রমিক বলে। শিশুরা বিভিন্ন ধরনের শ্রমের সাথে জড়িত। যেমন– ইট ভাঙা, ওয়ার্কশপ ও গ্যারেজে কাজ করা, অন্যের বাড়িতে কাজ করা, হোটেল ও চায়ের দোকানে কাজ করা, শহরের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করা, কুলিগিরি, অফিস-আদালতে খাবার পৌঁছানো, বাস-টেম্পোর হেলপারি ইত্যাদি। শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখতে ১৯৫৯ সালে জাতিসংঘ 'শিশু অধিকার সনদ' ঘোষণা করে। 'শিশু অধিকার সনদ–৯০' নামে পরিচিত এ সনদের বিষয়বস্তুগুলো হলো– ১. শিশু অধিকার বাস্তবায়ন, ২. পরিচয় সংরক্ষণ, ৩. মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ৪. সামাজিক নিরাপত্তা,

৫. শিশু স্বাস্থ্যের প্রাধান্য, ৬. বৈষম্যহীনতা, ৭. অবৈধ স্থানান্তর, ৮. অক্ষম ও উদ্‌বাস্তু শিশু, ৯. সামাজিক পর্যালোচনা, ১০. মাতাপিতার সাথে অবস্থানের অধিকার এবং ১১. মাতাপিতার অধিকার ও দায়িত্ব। উন্নত বিশ্বের দেশগুলো এ সনদের বিষয়বস্তুগুলো অনুসরণ করলেও বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলো তা অনুসরণ করতে পারছে না। শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত এ শিশুদের যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে না পারলে দেশের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হবে।

৫১ নাগরিক জীবন

অতীতে আমাদের জীবনযাত্রা গ্রামকেন্দ্রিক হয়ে থাকলেও ক্রমেই তা হয়ে উঠেছে শহরমুখী। নাগরিক জীবন পল্লিজীবনের তুলনায় গতিময় ও কৃত্রিম এবং সে কারণেই আধুনিক, যাকে আরও স্থূলভাবে বলা যায় সভ্য। পল্লিজীবন অকৃত্রিম আর নাগরিক জীবন তার উলটো। কৃত্রিমতা কথাটা শুনতে খারাপ হলেও সভ্যতার অজ্ঞা বলে আমরা একে গ্রহণ করেছি। একে নাগরিক জীবনের দোষ বলে গণ্য করাও মুশকিল। তবে নাগরিক জীবনে রয়েছে সহৃদয়তার অভাব, প্রাকৃতিক আবেষ্টনী হতে বিচ্ছিন্নতা আর কৃত্রিম বৈচিত্র্য। তবু নাগরিক জীবন স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ। কারণ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা গ্রামের তুলনায় নগরে বা শহরে বেশি প্রতিষ্ঠিত। শহরে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীলতা গ্রামের চেয়েও বেশি। কিন্তু এই নির্ভরশীলতার মূলে মুদ্রার সচলতা ছাড়া আর কোনো হৃদয়িক সম্পর্ক এখানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তবু নগরজীবন শিক্ষা, চিকিৎসা, অর্থবিত্ত, আমোদ-প্রমোদ, বিনোদন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে এতটাই অগ্রসর যে, একে অস্বীকার করা অসম্ভব। নাগরিক জীবনের বিশাল কর্মক্ষেত্র মানুষকে নিয়ে যেতে পারে উন্নতির শিখরে, তাই এর দোষ-ত্রুটি নয়, যথার্থতা করাই হতে পারে আমাদের লক্ষ্য।

৫২ সৌরবিদ্যুৎ

সূর্য সকল শক্তির মূল উৎস। সূর্যের আলোকশক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়, তাকে সৌরবিদ্যুৎ বলে। ঘরের ছাদে একটি সোলার প্যানেল বসিয়ে সূর্যের আলোকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংযুক্ত করে একটি বাড়ির প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব। প্রচলিত বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ঘনঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের হাত থেকে বাঁচতে হলে সৌরবিদ্যুৎ একটি স্থায়ী সমাধান। সৌরবিদ্যুৎ ঘর, মোবাইল ফোনের টাওয়ার, রাস্তার বাতি, সেচের পাম্প, ইলেকট্রিক সাইন বোর্ড ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়। সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন করতে হলে প্রথমে হিসাব করে নিতে হবে যে, কতটুকু বিদ্যুৎ প্রয়োজন অথবা কী কী ব্যবহার হবে। একটি সৌর প্যানেল, একটি ব্যাটারি, একটি চার্জ-কন্ট্রোলার, দুটি সিএফএল অথবা লেড ল্যাম্প হলেও ছোটো একটি পরিবারের প্রয়োজনীয় সৌরবিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব। সোলার প্যানেলের আয়তন ও ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে বিদ্যুৎ উৎপাদন। বর্ধিত জনসংখ্যার বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে সৌরবিদ্যুৎ খুবই কার্যকর। গ্রামীণ দুর্গম জনবসতির বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর জন্য সৌরবিদ্যুৎ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৫৩ বৃক্ষরোপণ অভিযান

জীবনের জন্য, বেঁচে থাকার জন্য বৃক্ষ অনিবার্য। বৃক্ষ মানবজীবনের এমন এক বন্ধু, যার কোনো বিকল্প নেই। মানুষ বুঝে অথবা না বুঝে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বৃক্ষনিধন করছে। ফলে বনের পর বন উজাড় হয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে পরিবেশ দূষণ ঘটছে। পরিবেশ হয়ে উঠেছে ভারসাম্যহীন। তাই ভারসাম্য রক্ষার্থে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি দেশের মোট আয়তনের ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সে তুলনায় আমাদের বনভূমি খুবই কম। বাংলাদেশের মোট আয়তনের মাত্র ১৬ ভাগ বনভূমি– যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। তারপরও উপর্যুপরি জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কাঠের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে, ফলে বনের পর বন উজাড় হচ্ছে। বনভূমির আয়তন ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে, যা খুবই উদ্‌বেগের ব্যাপার। এই অভাব পূরণের জন্য বাংলাদেশ সরকার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যেও কাজ করে যাচ্ছে। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। আরও বিস্তৃত আকারে এ পদক্ষেপ নেওয়া আশু দরকার। মূলত পরিবেশ সংরক্ষণ ও বনায়নের জন্য কার্যকর ভূমিকা আবশ্যক। যেদিন সকলে বুঝবে বৃক্ষ ছাড়া মানুষের একদিনও চলে না, প্রতিটি নিশ্বাসের যে অক্সিজেন প্রয়োজন, তা বৃক্ষই উৎপাদন করে; সেদিনই কেবল পরম বন্ধু বৃক্ষনিধন রোধ হয়ে বৃক্ষরোপণ অভিযান দ্রুত সম্প্রসারিত হবে।

৫৪ পরোপকারিতা

মানুষের অন্যতম গুণ হলো ‘পরের উপকার করা’। তাই অন্যের বা পরের উপকার করাকে পরোপকারিতা বলে। বস্তুত পরের উপকার করাই হলো মানুষের ধর্ম। পরোপকার বিভিন্নভাবে করা যায়। বিশেষত, সেবার মাধ্যমে পরোপকার করার মতো কার্য আর কিছু হতে

পারে না। কোনো মানুষ বিপদে পড়লে সে মানুষটিকে যদি সাহায্য করা যায় কিংবা যে-কোনো বিপদ থেকে তাকে পরিত্রাণ দেওয়া যায়, তাহলেই ‘পরোপকার’ হয়। এভাবে বিপদগ্রস্ত মানুষকে উপকার বা সাহায্য করার মাধ্যমে একজন সাধারণ মানুষ মহাপুরুষে পরিণত হতে পারেন। আমাদের মহানবি হজরত মোহাম্মদ (স) নিজে আক্রান্ত হয়ে পরের কল্যাণ করেছেন। মক্কার পথে-প্রান্তরে শত্রুরা তাঁকে পাথর ছুড়ে মেরেছিল। আর তাঁর শরীর থেকে রক্ত ঝরঝর করে পড়ছিল, তখনো তিনি বলেছিলেন ‘এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা করো।’ সুতরাং, ছাত্রজীবন থেকেই পরোপকারের ব্রত গ্রহণ করা দরকার।

৫৫ নারীশিক্ষা

বিশ্বের প্রতিটি শিশু মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে চোখ খুলে পায় মা ও মাতৃভূমির প্রতিকৃতি। বড়ো হয় মা ও মাটির স্নেহে। প্রথম শিক্ষা গ্রহণ করে মায়ের কাছ থেকে। শিক্ষিত মা মানেই শিক্ষিত সন্তান। শিক্ষিত সন্তান মানে উন্নত নাগরিক ও উন্নত জাতি। তাই একটি জাতির শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানে বড়ো হয়ে ওঠার প্রথম শর্ত শিক্ষিত মায়ের আঁচলে থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা। তাছাড়া নারী ও পুরুষ মানবসমাজের ভারসাম্য ও স্থিতির সমরূপ। তাই নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সহযোগিতা হচ্ছে সমাজসভ্যতার ক্রমবিকাশ। ফলে নারীকে পুরুষের সমান শিক্ষার সুযোগ না দিলে সে পিছিয়ে পড়বে। আর সভ্যতার বিকাশের গতি অনেকটা মন্থর হয়ে যাবে। তাই জ্ঞানবিজ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে নারীর আসন কার্যকর করা প্রয়োজন এবং তার পূর্বশর্ত হলো নারীশিক্ষা। উচ্চশিক্ষার ফলে আজ নারী সমাজের উন্নয়নে অর্থনীতি, রাজনীতি– সর্বক্ষেত্রে পুরুষের পাশপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। শিক্ষা, সাংস্কৃতিক তথা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আজ নারীর ভূমিকা প্রশংসনীয়। তাই নারীশিক্ষার প্রসার আজ সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও অত্যাবশ্যক। নারীশিক্ষার অগ্রগতির জন্য যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে, সেগুলো হলো– ১. নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ২. প্রয়োজনীয় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, যাতে শুধু নারী/মেয়েরা পড়ালেখা করতে পারে, ৩. নারী নির্যাতন বন্ধ করা, ৪. মেয়েদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়ার জন্য পৃথক পরিবহণ, ৫. বয়স্ক নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, ৬. শিক্ষাব্যবস্থা অবৈতনিক ও বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা, ৭. শিক্ষাগ্রহণে নারীদের উৎসাহ দান করা এবং ৮. উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা। সবশেষে বলা যায়, “বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।” আমাদের স্বাধীন দেশে নারীকে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে হবে। তবেই দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হবে।

৫৬ দুর্নীতি

একটি সমাজের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে দুর্নীতি। আমাদের দেশে এটি একটি বহুল আলোচিত ও প্রচারিত বিষয়। ঘুস এবং দুর্নীতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত দুটি শব্দ। বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি যে-কোনো ক্ষেত্রেই দুর্নীতি স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধে নিয়েছে। লাগামহীন দুর্নীতির কারণে জনগণের কোটি কোটি টাকা লুট যাচ্ছে। এদেশে এখন দুর্নীতির মূল অনেক গভীরে চলে গেছে। এত অল্প সময়ে বাংলাদেশে দুর্নীতির ক্ষেত্র ও ধরন সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করা খোদ দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষেও সম্ভব নয়। সমাজের উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত সর্বত্রই দুর্নীতির আক্রমণ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্নীতির মাত্রাতিরিক্ত বহুমুখী বিস্তারের ফলে আমরা আমাদের নালিশ জানানোর মানুষদেরও হারিয়ে ফেলছি। এতকিছু সত্ত্বেও এটা আশার কথা যে, বর্তমান সরকার সমাজ থেকে দুর্নীতি দমনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

NABARUN PUBLICATION

সাম্প্রতিক বিষয়ের ২০টি অনুচ্ছেদ

১. জুলাই গণ-অভ্যুত্থান

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে সরকারি চাকরিতে কোটা-ব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মাধ্যমে এর সূচনা হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে আন্দোলনটি বৃহত্তর গণআন্দোলনে রূপ নেয়। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণে আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের সময় সংঘর্ষ, প্রাণহানি ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা দেশ-বিদেশে আলোচনার সৃষ্টি করে। পরবর্তী রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এ ঘটনাকে 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান' নামে অভিহিত করা হয়। এই অভ্যুত্থান তরুণ সমাজের সাহস, নেতৃত্ব, দেশপ্রেম এবং অধিকার আদায়ের চেতনাকে নতুনভাবে তুলে ধরে। একই সঙ্গে এটি সুশাসন, জবাবদিহি, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে জাতিকে নতুনভাবে ভাবতে উদ্‌বুদ্ধ করে। ইতিহাসের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ গণআন্দোলনের মতো জুলাই গণ-অভ্যুত্থানও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শিক্ষণীয় একটি ঘটনা। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা যে অপরিহার্য, এই অভ্যুত্থান সে বার্তাই বহন করে।

২. নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ

নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ বলতে এমন একটি রাষ্ট্র গঠনের প্রত্যাশাকে বোঝায়, যেখানে ন্যায়বিচার, সুশাসন, মানবিক মূল্যবোধ, আইনের শাসন এবং সমান সুযোগ নিশ্চিত হবে। একটি উন্নত রাষ্ট্র গঠনের জন্য কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রতিও সমান গুরুত্ব দিতে হয়। দুর্নীতি, বৈষম্য, বেকারত্ব ও সামাজিক অবক্ষয় দূর করে একটি আধুনিক, সমৃদ্ধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ে তোলাই নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের মূল লক্ষ্য। এ কাজে তরুণ সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সততা, উদ্ভাবনী চিন্তা, দেশপ্রেম ও কর্মদক্ষতা জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। পাশাপাশি রাষ্ট্র, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ও সাধারণ জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টাও অপরিহার্য। প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন এবং মানবিক মূল্যবোধের চর্চার মাধ্যমে একটি নিরাপদ ও টেকসই বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব। নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ কোনো একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাজ নয়; এটি সমগ্র জাতির সম্মিলিত দায়িত্ব।

৩. অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হলো এমন একটি সরকার, যা বিশেষ রাজনৈতিক বা সাংবিধানিক পরিস্থিতিতে সীমিত সময়ের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রশাসনিক কার্যক্রম সচল রাখা, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং একটি গ্রহণযোগ্য ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিত করা। এ ধরনের সরকারের সফলতা নির্ভর করে নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ওপর। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে। জনগণের আস্থা অর্জন এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করা এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের নজির রয়েছে। একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যদি সংবিধান, আইন ও জনগণের প্রত্যাশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে, তবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই এ ধরনের সরকারের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও জনকল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

৪. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (Artificial Intelligence) বর্তমান বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন। এটি এমন একটি প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে কম্পিউটার বা যন্ত্র মানুষের মতো শেখা, বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা অর্জন করে। বর্তমানে শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প, ব্যাংকিং, যোগাযোগ, পরিবহন

এবং গবেষণাসহ প্রায় সব ক্ষেত্রেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর মাধ্যমে কাজের গতি ও নির্ভুলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সময় ও ব্যয় কমছে। তবে এর কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে কিছু প্রচলিত পেশার চাহিদা কমে যেতে পারে। তাই প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন দক্ষতা অর্জন করা সময়ের দাবি। একই সঙ্গে তথ্যের নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং প্রযুক্তির নৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করাও জরুরি। যথাযথ পরিকল্পনা ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে পারলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বাংলাদেশের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

৫. চতুর্থ শিল্পবিপ্লব

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব হলো এমন একটি প্রযুক্তিনির্ভর পরিবর্তনের যুগ, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স, ইন্টারনেট অব থিংস (IoT), বিগ ডেটা, ক্লাউড কম্পিউটিং এবং স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির সমন্বয়ে উৎপাদন ও সেবাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটছে। এ বিপ্লব মানুষের কর্মজীবন, শিক্ষা, ব্যবসা এবং শিল্পক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। একই সঙ্গে এটি নতুন ধরনের দক্ষতার চাহিদাও সৃষ্টি করেছে। তাই বর্তমান শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান নয়, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, সৃজনশীল চিন্তাশক্তি, সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা এবং উদ্ভাবনী মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা, স্টার্টআপ সংস্কৃতি, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং ডিজিটাল অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্ব দিচ্ছে। তবে প্রযুক্তির সুফল সবার কাছে পৌঁছে দিতে হলে ডিজিটাল বৈষম্য কমানো এবং প্রযুক্তির নৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। দক্ষ ও প্রযুক্তিবান্ধব তরুণ প্রজন্মই চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি হতে পারে।

৬. সাইবার নিরাপত্তা

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের ফলে বর্তমান বিশ্ব ক্রমেই ডিজিটালনির্ভর হয়ে উঠছে। ব্যাংকিং, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি সেবা এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগ—প্রায় সব ক্ষেত্রেই ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে সাইবার অপরাধের ঝুঁকিও বেড়েছে। ব্যক্তিগত তথ্য চুরি, হ্যাকিং, অনলাইন প্রতারণা, ভুয়া ওয়েবসাইট, পরিচয় জালিয়াতি এবং ক্ষতিকর সফটওয়্যারের আক্রমণ বর্তমানে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এসব ঝুঁকি থেকে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রকে সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রয়োজন কার্যকর সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা। শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার, দ্বিস্তরবিশিষ্ট নিরাপত্তা (Two-factor Authentication), নিয়মিত সফটওয়্যার হালনাগাদ এবং সন্দেহজনক লিংক এড়িয়ে চলা সাইবার নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একই সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সাইবার আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়নও জরুরি। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে নিরাপদ সাইবার পরিবেশ নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

৭. ডিজিটাল সাক্ষরতা

ডিজিটাল সাক্ষরতা হলো তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি নিরাপদ, দক্ষ এবং দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করার জ্ঞান ও সক্ষমতা। বর্তমান যুগে কেবল পড়তে ও লিখতে জানাই যথেষ্ট নয়; ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, চাকরিজীবী, উদ্যোক্তা এবং সাধারণ নাগরিক—সবার জন্য ডিজিটাল সাক্ষরতা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তথ্য অনুসন্ধান, তথ্যের সত্যতা যাচাই, অনলাইন যোগাযোগ, ডিজিটাল সেবা গ্রহণ এবং ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এ দক্ষতা প্রয়োজন। ডিজিটাল সাক্ষরতার অভাবে মানুষ সহজেই ভুয়া খবর, অনলাইন প্রতারণা ও সাইবার অপরাধের শিকার হতে পারে। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পরিবারে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা জরুরি। দক্ষ ও সচেতন নাগরিক গড়ে তুলতে ডিজিটাল সাক্ষরতার কোনো বিকল্প নেই। প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার ব্যক্তি ও দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৮. ভুয়া খবর

NABARUN PUBLICATION

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে ভুয়া খবর বা ফেক নিউজ একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই ছাড়াই অসত্য বা বিভ্রান্তিকর তথ্য খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অনেক সময় এসব ভুয়া খবর মানুষের মধ্যে আতঙ্ক, বিভ্রান্তি, গুজব, সামাজিক অস্থিরতা এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টি করে। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এমনকি রাষ্ট্রও এর নেতিবাচক প্রভাবের শিকার হতে পারে। তাই কোনো তথ্য বিশ্বাস বা প্রচার করার আগে তার উৎস যাচাই করা প্রত্যেক সচেতন নাগরিকের দায়িত্ব। গণমাধ্যম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং পরিবারকেও এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে ভূমিকা রাখতে হবে। তথ্য যাচাইয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং দায়িত্বশীলভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করলে ভুয়া খবরের বিস্তার অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব। সত্য ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের চর্চাই একটি সচেতন ও দায়িত্বশীল সমাজ গঠনের অন্যতম শর্ত।

৯. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাব

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আধুনিক জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফেসবুক, ইউটিউব, এক্স, ইনস্টাগ্রামসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম মানুষের যোগাযোগ, তথ্য আদান-প্রদান, শিক্ষা, ব্যবসা এবং বিনোদনের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। বর্তমানে শিক্ষার্থীরা অনলাইন ক্লাস, শিক্ষামূলক ভিডিও এবং বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে সহজেই জ্ঞান অর্জন করতে পারছে। উদ্যোক্তারাও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে ব্যবসার প্রসার ঘটাচ্ছেন। তবে এর কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে। অতিরিক্ত ব্যবহার সময় অপচয়, মানসিক চাপ, আসক্তি এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার কারণ হতে পারে। পাশাপাশি ভুয়া খবর, সাইবার বুলিং এবং গোপনীয়তা লঙ্ঘনের ঘটনাও উদ্বেগজনক। তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে সংযম, সচেতনতা এবং নৈতিকতা বজায় রাখা প্রয়োজন। সঠিকভাবে ব্যবহার করা গেলে এটি ব্যক্তি ও সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

১০. জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান বিশ্বের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ এ পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর একটি। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদীভাঙন, খরা, অতিবৃষ্টি এবং লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে কৃষি, মৎস্যসম্পদ, জীববৈচিত্র্য এবং মানুষের জীবন-জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের বহু মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হচ্ছে। এ সংকট মোকাবিলায় বৃক্ষরোপণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার, পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন এবং কার্বন নিঃসরণ কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি জলবায়ু অভিযোজন ও দুর্যোগ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতাও জরুরি। পরিবেশ রক্ষা শুধু সরকারের দায়িত্ব নয়; প্রতিটি নাগরিকের সচেতন অংশগ্রহণের মাধ্যমেই একটি টেকসই ও নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

১৬. ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ফ্রিল্যান্সিং হলো স্বাধীনভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনলাইনে কাজ করা, আর আউটসোর্সিং হলো কোনো প্রতিষ্ঠানের কাজ অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করানো। ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা এবং তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশেও এ খাত দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। গ্রাফিক ডিজাইন, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, কনটেন্ট রাইটিং, ডিজিটাল মার্কেটিং, ভিডিও এডিটিং, ডেটা অ্যানালাইসিস এবং সফটওয়্যার উন্নয়নসহ নানা ক্ষেত্রে তরুণরা আন্তর্জাতিক বাজারে কাজ করছেন। এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পাশাপাশি বেকারত্ব হ্রাসেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তবে সফল ফ্রিল্যান্সার হতে হলে ইংরেজি ভাষাজ্ঞান, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, সময়ানুবর্তিতা এবং পেশাগত সততা অপরিহার্য। সরকার ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে পারলে বাংলাদেশ বৈশ্বিক ফ্রিল্যান্সিং বাজারে আরও শক্ত অবস্থান অর্জন করতে পারবে।

১৭. দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন

একটি দেশের উন্নয়নের প্রধান শক্তি হলো তার দক্ষ মানবসম্পদ। প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত হলেও দক্ষ ও শিক্ষিত জনশক্তির মাধ্যমে একটি দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি করতে পারে। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়, কারিগরি জ্ঞান, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, যোগাযোগক্ষমতা, সৃজনশীলতা এবং সমস্যা সমাধানের সক্ষমতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে তরুণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা তুলনামূলক বেশি। এই জনশক্তিকে যথাযথ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে সম্পদে পরিণত করা সম্ভব। তথ্যপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স, স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে দক্ষ কর্মী তৈরির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। একই সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধ, কর্মনিষ্ঠা এবং দায়িত্ববোধসম্পন্ন নাগরিক গড়ে তুলতে হবে। দক্ষ মানবসম্পদই একটি দেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। তাই জাতীয় উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই।

১৮. মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা

মানসিক স্বাস্থ্য মানুষের সার্বিক সুস্থতার একটি অপরিহার্য অংশ। একজন মানুষ শারীরিকভাবে সুস্থ হলেও মানসিকভাবে অসুস্থ হলে স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হয়। বর্তমান সময়ে পড়াশোনার চাপ, কর্মক্ষেত্রের প্রতিযোগিতা, পারিবারিক সমস্যা, প্রযুক্তিনির্ভর জীবনযাপন এবং সামাজিক নানা কারণে মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদ্বেগ, হতাশা, একাকিত্ব ও বিষণ্নতা এখন অনেক মানুষের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু আমাদের সমাজে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে এখনো নানা ভুল ধারণা ও সংকোচ রয়েছে। ফলে অনেকেই প্রয়োজনীয় সহায়তা নিতে আগ্রহী হন না। এ অবস্থার পরিবর্তনে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বা মনোবিজ্ঞানীর পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। নিয়মিত ব্যায়াম, পর্যাপ্ত বিশ্রাম, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং ইতিবাচক চিন্তাভাবনা মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি একটি সুস্থ, মানবিক ও উৎপাদনশীল সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত।

১৯. স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম

স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম হলো কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের পক্ষ থেকে বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, মহামারি কিংবা অন্যান্য সংকটের সময় স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রক্তদান, বৃক্ষরোপণ, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, শিক্ষাসহায়তা, ত্রাণ বিতরণ, স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশ সংরক্ষণমূলক কর্মকাণ্ডে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ, সহযোগিতার মনোভাব, নেতৃত্বগুণ এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের বিকাশ ঘটে। বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবার মানসিকতা গড়ে উঠলে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মানবকল্যাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। মানবসেবাই সর্বোত্তম সেবা—এই আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে সমাজের প্রতিটি মানুষকে স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে এগিয়ে আসা উচিত। এতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র—সকলেই উপকৃত হবে।

NABARUN PUBLICATION

২০. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs)

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা **এসডিজি** (Sustainable Development Goals) হলো জাতিসংঘ ঘোষিত ১৭টি বৈশ্বিক লক্ষ্য, যা ২০৩০ সালের মধ্যে একটি শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও বৈষম্যহীন বিশ্ব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণ, ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব, মানসম্মত শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য, লিঙ্গসমতা, বিশুদ্ধ পানি, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি, কর্মসংস্থান, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ এসডিজির গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশ এসব লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তবে এসডিজি অর্জন কেবল সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়; এ জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, উন্নয়ন সংস্থা এবং সাধারণ মানুষের সক্রিয়

অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই পরিবেশ রক্ষা, শিক্ষা বিস্তার, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে ভূমিকা রাখা উচিত। সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করে একটি উন্নত, মানবিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

SINCE - 1993
NABARUN PUBLICATION